অসদুক্তি - হলাহল

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

অনেক কাল আগে ক্যাওড়াতলা শ্মশানের কাছে সাহানগর পাড়ায় আমাদের ভাড়া বাড়ি ছিল। সেখানে তারক মিত্তির লেনে বিশাল পরিসর বাড়ির মাঠে আমরা তিন - চার জন ছেলে গুলি খেলছিলাম। তখনকার জীবনে গুলি - খেলা, টিক - ডাঙ, গাদি ইত্যাদি পয়সাহীন খেলাগুলিই আমাদের ক্রীড়ার উপাদান ছিল। জীবনের প্রথম গুলি কিনতে যেটুকু পয়সা লাগত, তা ঠাকুমা - দিদিমার স্নেহের দান অথবা কেরানী পিতার সযত্নরক্ষিত পকেটের গ্রন্থিভেদ করেই জুটে যেত। কিন্তু তার পরে তোমার গুলি - জীবনের উন্নতির সবটাই নির্ভর করত নিজস্ব চেষ্টা, লেগে থাকা, নিরন্তর অভ্যাস এবং আত্মকৌশলের উপর। ছোটবেলায় পড়াশুনো ব্যাপারটা আমাদের অনেকের কাছেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি চতুর্থ কর্তব্যের মধ্যে ছিল, বরঞ্চ ঈষদধিক অঙ্গুলী - হেলনে, মধ্যমা - তর্জনী - বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শৈল্পিক প্রযুক্তিতে আমি কবে নির্ভুল লক্ষ্যে অন্যের গুলি ফাটিয়ে দেবো --- এই তো ছিল জীবনের প্রথম উচ্চাশা।

যাঁরা গুলি খেলা জানেন বা এখনো যাঁরা মনে রেখেছেন, তাঁরা স্মরণ করবেন --- গুলি - খেলার সাধারণ দুটি প্রকার হল 'খাটান' এবং 'জেত্তাল'। যাদের পকেট - ভর্তি গুলি নেই অর্থাৎ এখনকার ভাষায় যাদের গুলির পিছনে 'প্রায়র ইনভেস্টমেন্ট' নেই, যারা প্রতিপক্ষকে জেতার পর থেকেই খাটাতে থাকবেন ইচ্ছামত এবং সেটাই 'খাটান'। নিদেনপক্ষে দুটি গুলি থাকলেই এই খেলা চলে, তারপর মানুষ দেখে সুযোগ বুঝে যদি পকেটভর্তি কোনো গুলিওয়ালার দেখা পাওয়া যায়, তবে তার সঙ্গে 'জেত্তাল' খেলায় নামলেই অনন্ত গুলি আমার পকেটে আসতে পারে। আর ঠাকুমা - দিদিমার দানের অপেক্ষা নেই, প্রয়োজন নেই সদা - সতর্ক কষ্টাকুল কেরানী - পিতার কষ্টার্জিত আনা - পয়সা - আধুলির।

একদিন এইভাবেই সেই পুরাতন মাঠে প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুলি খেলছিলাম। এমন সময় সেই মাঠের প্রান্তিক দরজায় একজন ভিখারি - দশার মানুষ একটি ছোট পুটলি হাতে প্রবেশ করল। সে একটু এগিয়ে গিয়ে মূল দরজায় আঘাত করে ভিক্ষেও চাইল না, কিংবা গলায় তুলল না কোনো বেসুরো সুর যাতে আকর্ষিত হতে পারে গৃহস্থ, এমনকি কোনো প্রয়োজনের কথাও বলল না। আমাদের গুলি খেলতে দেখে সে পুঁটলি পাশে রেখে পর্য্যঙ্কবন্ধন করে বসল এবং নিবিষ্ট মনে আমাদের গুলি - খেলা দেখতে আরম্ভ করল। বেশ কিছুকাল কেটে গেল এইভাবে, আমাদেরও আর খেয়াল নেই তাকে --- আমি তখন গুলির পর গুলি, পাঁজা - পাঁজা গুলি জিতে চলেছি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে --- হঠাৎই এক পরিণত মুহূর্তে সেই প্রৌঢ় ভিখারি - দশার মানুষটি আমাকে ডাকল এবং বলল --- 'বাবু! এই খেলায় তুমি ফাস্টো।'

আপনারা বিশ্বাস করবেন না --- এই যে প্রত্যাদেশের মতো কথাটা --- 'এই খেলায় তুমি ফাস্টো' --- এই কথাটা আজও আমার মনে বড় সুখের মতো ব্যথা জাগায়। বিদ্যাজীবনের কোনো বৃহৎ পরীক্ষাতেই আমি ফাস্ট হতে পারিনি, ব্যবহারিক জগতে তেমন কোনো পদাধিকার নেই, যাতে বেশ উজ্জ্বল বোধ করতে পারি নিজের সম্বন্ধে। কিন্তু বাল্যকালের সেই অসতর্ক মুহূর্তে প্রৌঢ় - বৃদ্ধ ভিখারি -প্রতিম মানুষটির সেই আপ্লুত উচ্চারণ, সেটা আজও আমার মনে পুলকের সঞ্চার করে। এখন শুধু ভাবি আর বিশ্লেষণ করি, মাঝে মাঝে ব্যবচ্ছেদ করি সেই প্রৌঢ় - বৃদ্ধের মন এবং নিজেকেও বারবার। জিজ্ঞাসা হয় --- আচ্ছা! ওই লোকটার কি কোনো কাজ ছিল না খেয়েদেয়ে, অর্থাগমের চিন্তা নেই, অবিচিন্ত্য কৌশলে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা নেই, বিনা কারণে খানিক ক্ষণ বসে থাকল, গুলিখেলার মতো একটা অকুলীন খেলা দেখল কতো ক্ষণ বসে - বসে, তারপর বিজ্ঞজনের মতো একটা বিরাট মন্তব্য করে গেল এমন মানুষের সম্বন্ধে-যে মন্তব্য না করলে এই বিরাট পৃথিবীর এতটুকু আসত - যেত না।

এই যে অক্ষম চরিত্র --- আমি এবং সেই ভিখারি - প্রতিম --- এই দুজনার মধ্যে একটা জায়গায় বড় মিল আছে। এক জনের নিবিষ্ট মনে অকাজ করে যাবার ক্ষমতা এবং আর একজনের বসে বসে সেই অকাজ নিরীক্ষণ করে যাবার ক্ষমতা। আজকাল আর কেউ অকাজ করে না। সকলে কাজ করে এবং এই করলে আখেরে এই লাভ হবে --- সেটা বুঝে কাজ করে। অল্পবয়সী ছেলে - মেয়ে যারা, তারাকেউ দঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোর দুধ দোয়া দেখে না এখন, ভোরবেলায় উঠে কোনো দিন দেখে না --- আলো ফোটার কত আগে একটা কাক কতক্ষন তার রাত্রিযাপনের গ্লানি অনুভব করে কা - কা করে নিজের ডালে বসেই। কৌতূহল দেখি না কারো মুখেই। অসাধারণ একটি কবিতা শোনার পর, অথবা অনন্য বাগ্‌বৈচিত্র্যে মুগ্ধ - স্তব্ধ হতে দেখি না কাউকে। আজকাল একজন ক্লাসে ফার্স্ট হয় আর পঞ্চাশ জনই ফাস্ট হবার চেষ্টা করে --- কেউ এখন আর গুলি খেলে সময় নষ্ট করে না, গুলি খেলা কেউ দেখেও না। সকলেই যেন কেমন ছুটছে, কিন্তু বড় অসন্তুষ্ট হয়ে ছুটছে, একটা কিছু তাকে পেতেই হবে, মনে কারো অকারণের আনন্দ নেই। কেউ আর এতটুকু নষ্ট হতে চায় না।

আমাদের শাস্ত্র বলে --- চারভাবে লোকে নষ্ট হতে পারে। 'কেচিদ্ অজ্ঞানতো নষ্টাঃ', অর্থাৎ জ্ঞান না থাকার ফলে কেউ কেউ নষ্টহয়ে যায়। আমার তো মনে হয় কথাটা সোজা ভাবে বললে সটান এইরকম বলা যায় -- লেখা - পড়া না শিখে সারা জীবন যে অজ্ঞ হয়ে রইল, সে একভাবে নষ্ট করল নিজেকে। দ্বিতীয় প্রকার --- 'কেচিন্নষ্টাঃ প্রমাদতঃ।' কেউ কেউ নষ্ট হয় ভুল করার ফলে। জীবনের পথে যেতে যেতে কেউ কেউ ভুল করে বারবার, এমনই ভুল যা শোধরানো যায় না, ফলে বিফল হয় কেউ কেউ। কেচিদ্ জ্ঞানাবলেপেন--- কারো সর্বনাশ ঘটে জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবার কারণে। কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এবং পরশ্রীকাতরতা মানুষের স্থিত জ্ঞান নষ্ট করে দেয়। আর শেষ যে চতুর্থ উপায়ে মানুষ সর্বনাশের পথে যায়, সেটা হল --- দুষ্ট লোক যখন আর একজনকে দুষ্ট করে তোলেনষ্ট লোক যখন অন্য জনকে বিনাশের পথে নিয়ে যায় --- নীতিবাগীশ যাকে বলেছেন --- 'কেচিন্নষ্টৈস্তুনাশিতাঃ'। নষ্ট লোকের দ্বারাই কিছু লোক নষ্টামির পথে যায়।

এই তো চার ভাবে বিনাশের পথে যাওয়া --- নীতিশাস্ত্রের চিহ্নিত উপকরণ। কিন্তু আমরা যারা নষ্ট হয়ে গেছি, তারা তো আরো কতভাবে নষ্ট হওয়ার পথ জানি। আমরা অজ্ঞানেও নষ্ট হইনি, ভ্রম - প্রমাদবশতও নষ্ট হইনি, এমনকি মাঝখানে জ্ঞানও কিছু অবলুপ্ত হয়নি আমাদের। তবে হ্যাঁ, নষ্ট কিছু লোক দেখেছি আমি --- যঁ

ারা চুরি - ডাকাতিও করেননি, গুন্ডা-বদমাইশিও করেননি অথবা কাপট্য - লাম্পট্যও করেননি। তবে হ্যাঁ, এঁরা আমার অধীত গুলি - বিদ্যা এবং ডাংগুলি - বিদ্যার অপর পারে ছিলেন। একজনকে দেখেছিলাম -- তিনি কথা বলতে - বলতে, মুগ্ধ প্রতিবেদনে অথবা অতি - আধুনিকা রমণীর কাছেও বৈষ্ণব পদাবলীর কলি গেয়ে উঠতেন। এমন মানুষ দেখিনি আমি, যিনি তাঁর সময়োচিত পদাবলীর সময়োচিত শব্দ - সৌকর্যে এবং কণ্ঠ - মাধুর্যে আলোড়িত না হতেন। আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো পাগল - করা পাগল কবিকে দেখেছি আমার যৌবন - সন্ধিতে --- তখনও তিনি স্ফীত, দৃপ্ত, চূড়ান্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় হয়ে ওঠেননি। অথচ তাঁর জন্য কী আকর্ষণ আমার। আমি ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মতো ত্রুদ্ধ - মধুর অধ্যাপক দেখেছি, বাইরে তিনি বজ্রাদপি কঠিন, অন্তরে তিনি কুসুমাদপি কোমল। একটা সাধারণ বই পড়ার সময় তিনি এতগুলি রেফারেন্স বই বুঝিয়ে দিতেন, পড়তে বলা নয়, বুঝিয়ে দিতেন, সিলেবাসে নেই এমন সব সংস্কৃত ছন্দ তিনি নির্ভুল উচ্চারণে এমন সুন্দর করে বলতেন আত্মবিনোদনের উল্লাসে যে, আজও আমি সেই সব ছন্দোধ্বনি চকিত স্বপ্নে শুনতে পাই।

সত্যি কথা বলতে কি, এরাঁ কেউ ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া ছেলে ছিলেন না। কিন্তু জীবনকে দেখার আনন্দ নিয়ে জন্মেছিলেন এঁরা, সব ব্যাপারে এঁদের অসম্ভব কৌতূহল ছিল --- যে কৌতূহল ছিল সেই ভিখারি - দশার মানুষটির মধ্যে, যিনি ভিক্ষাটন বন্ধ রেখে দুঘন্টা গুলিখেলা দেখে শেষে একটা সিদ্ধ মন্তব্য করে যান --- এই খেলায় তুমি ফাস্টো। এখন সর্বত্র সবাইকে শুধু ছুটতে দেখছি কৌতূহলহীন, ভাবলেশহীন, অনুভবহীন। শব্দমন্ত্রে রসিকতা করলে মানুষ এখন ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে তাকে, ব্যঞ্জনাময় কবিতা শোনালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু- একটি ছাত্র - ছাত্রী এখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে -- আচ্ছা স্যর! আমাদের পরীক্ষায় যে টপিকগুলো থাকবে, সেটা পরের দিন আলোচনা করে দেবেন কিন্তু। বেশ বুঝতে পারি, আমি এঁদের পড়ানোর যোগ্য শিক্ষক নই। ওদের বলতে পারিনি --- আমার মাস্টারমশাই বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক পড়াতে গিয়ে কোনো দিন ছ'টা কি সাতটা শ্লোক - কারিকার ওপারে যেতে পারেননি। আর প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস মশাই জেনারেল ইতিহাসের ক্লাসে চাইনিজ লিপির মনোসিলেবিক তত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা দিতে - দিতে গোটা বোর্ডে চাইনিজ লিপি লিখে ফেলতেন। আর সিলেবাসের দিক থেকে চিন্তা করলে তিনি কোনোদিন ষোড়শ মহাজনপদেরঅধ্যায় পেরোতে পারেননি ক্লাসে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে -- এ তুমি কেমন উপদেশ দিচ্ছ! তাহলে কি তুমি ইস্কুল - কলেজে সিলেবাস শেষ না করে সরকারি অর্থে বুক্‌নি - বিতরণের পক্ষে হায়! এতক্ষণ বকার পর আমার কথার যদি এই মানে হয়, তবে কারে কই, কারে বুঝাই । আমি আসলে আজকালনষ্ট হওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকি। ওই আমার নষ্ট - হওয়া বিশাল বুদ্ধি অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ক্লাসের টিনে - বাঁধা প্রথম হবার সম্ভাব্য জনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ''অরণ্যদিতং কৃতং শবশরীরমুদ্‌বর্তিম্'। আমি এতক্ষণ ধরে অরণ্যে রোদন করেছি হে! এতক্ষণ ধরে আমি একটা শবদেহ ধরে নাড়াচাড়া, ওলট - পালট করবার চেষ্টা করেছি। জলে ফোটে যে পদ্মফুল, তাকে এনে আমি স্থলে পুঁতেছি, উষর মভূমি না বুঝে এতক্ষণ আমি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে গেছি --- 'স্থলে 'অজমবরোপিতং সুচিরমুষরে বর্ষিতম্'।

আমি বিষ্ণুবাবুর কষ্ট বুঝতে পারি। আজকের দিনের মানুষ দেখলে তিনি আত্মহত্যা করতেন। তিনি জানতেন না এই হন্তারক সময়ের কথা --- এখন সকলেই কেমন গুছিয়ে বড় হতে চায়। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র --- ছাত্রীদের মধ্যেও এখন এমন এমন প্রতিযোগিতা যে ক্লাসের পঞ্চাশ জনই ফার্স্ট হতে চায়। বাচ্চাদের কাছে বাবা - মায়ের অনির্বাণ মন্ত্রজল্প --- ও পারছে, তুমি পারবে না কেন। এখন আর কোনো পাগল ছেলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে গোর দুধ দোয়া দেখে না, কোনো চতুর্দশী বালিকা সুযোগই পায় না সরষে - খেতের হলুদের মধ্যে চুল - এলো দাঁড়িয়ে থাকার। কেউ এতটুকু নষ্ট হতে চায় না, এতটুকু সময় অপ্রয়োজনে ব্যয় করে না কেউ।

আমার জীবনে আমি একটি ছেলেকে দেখেছিলাম, সে খুব ভাল রেজাল্ট্ করত, ক্লাসে ফার্স্ট হত। অথচ জীবন্ত মধুর উদাহরণ, জীবনের বিচিত্র কাহিনী অথবা সিলেবাসের বাইরে কোনো কৌতূহলের কথা শুনলে সে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে থাকত, কবিতার লাইন বল্‌লে ঝট করে টুকে নিয়ে বলত --- এটা কোথায় পাওয়া যাবে, কোন বইতে আছে। সে সারা জীবন ফার্স্ট হয়ে এখন কলেজে পড়ায় --- ছাত্রেরা বলে -- উনি সব কেমন মুখস্থের মতো বলে যান। খারাপভাবেই বলে। আমি বলতাম --- তুমি পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছুতে আনন্দ পাও না কেন? সে বলত -- কী লাভ? দেখুন, এখানেও সেই লাভের অঙ্ক। আসলে নির্বোধ মানুষও কিন্তু একরকম নয়। ফার্স্ট হলেই যে সে বোধহীন যান্ত্রিক হয়ে উঠবে না, এমন কোনো কথা নেই। শাস্ত্রী - সুজনের 'বহুশ্রুতি' বলে একটা শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন। কথাটার সাধারণ অর্থ শাস্ত্রজ্ঞতা, জ্ঞান। কিন্তু আমার মনে হয় -- এই শব্দটার মধ্যে এই সিলেবাসের বাইরে যাবার মর্ম লুকোনো আছে অর্থাৎ এমন একজন পণ্ডিত -- যে অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে, বিচিত্র বিষয়ে যাঁর অনুসন্ধিৎসা আছে। তবু জানি -- বহুশ্রুতি মানেই সেই কৌতূহল, যাতে কান খোলা থাকে সবসময় অথবা কান এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, যেমনটি মাঝে মাঝে চোখ।

আসলে বহু জানা, বহু দেখা অথবা বহু অনুভব করার যে মধু মানুষের মধ্যে থাকে, তাকে ঠিক সাধারণ বিদ্যার অথবা একমুখী বিদ্যার পরিমাপ দিয়ে বোঝা যায় না। তাকে বোঝার জন্য একটা পাগলপন মনের দরকার আছে। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রের যে মানুষটা লিখেছিল --- শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ --- অনেক শাস্ত্র পড়েও অনেক কেমন মুর্খই থেকে যায়। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন, যে বই পড়ে এম.এ/ বি.এ. পাশ করার মধ্যে, অন্তত ওই পাশ করা বা ফাস্ট হওয়াটা যেখানে জীবনে মোক্ষলাভের পর্যায়ে পড়ে, তার মধ্যে বিদ্যার কোনো দ্যুতি থাকবে না। অধ্যাপক হিসেবে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিষয় এবং তার মধ্যে কোনো বিশেষ বিষয়ই যখন একটি কৌতূহলহীন বিষয়ী ছাত্রকে পড়াতে যাই তখন যেন মনে হয় -- বহুক্ষণ ধরে যেন কুকুরের লেজ টেনে - টেনে সোজা করার চেষ্টা করছি, অথবা বধিরের কানে কানে মধুর মন্ত্রজল্প -- বিষয়ী ছাত্র প্রশ্নোত্তর ছাড়া কিছু বোঝে না। আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুঝি অদ্যতন ছাত্র - সমাজের ওপর বড় ক্ষুব্ধ। আরে ছাত্র তো এই মানব - সমাজের একটা অঙ্গ। আমার ধারণা, চুরি - বাটপারি -তঞ্চকতা এবং জঙ্গীপনা যেমন একটা শ্রেণীর মধ্যে বেড়ে চলেছে, তেমনই তা উলটো দিকে অন্য একটা শ্রেণী যেন চোখ - মুখ - কান শরীরের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে কেমন যেন কচ্ছপপানা হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে তার এমন আবরণ যেন ভেদ করা যায় না কচ্ছপের খোলস। ছাত্র - সমাজ, কি যুবসমাজের সেই অংশ তো এই দিশ্যোব্যাপী কূর্মাবতারে একাংশে মাত্র। আমি একদিন একদল অতিশুশ্রূষু ছাত্র - ছাত্রীদের মহাভারতের পাঠ দিতে দিতে বলেছিলাম ওদের - তোরা কেউ রাস্তায় ঝগড়া লাগলে, মারামারি লাগলে দাঁড়িয়ে দেখিস, প্রতিবেশীর ঘরের দাম্পত্য কলহ শুনিস, উপভোগ করিস? বেশীর ভাগ বলেছিল --- না, না! ওসব ঝগড়া - মারামারির মধ্যে আমরা নেই, কোথায় কী হয় বলা যায়? আর প্রতিবেশীর ঘরের দাম্পত্য - কলহ শুনলে বাবা জানালা বন্ধ করে দেন। বাবা বলেন --- এ - সব শোনা অসভ্যতা। আমি বললাম --- সে কীরে, তাহলে তোরা জীবনে পাক্‌বি কী করে? এর উত্তরে একটি কোমল হৃদয় শিশুর মতো অনার্সের ছাত্র একজন বলেছিল -- পেকে যাওয়া কি ভাল, স্যর?

আমি এ - কথার জবার না দিয়ে সরাসরি মহাভারতে চলে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম --- একটা জীবন্ত সমাজের কথা শোন রে গাধা। কথাটা ব্যাস বলছেন, যোগী, ত্যাগী, তপস্বী ব্যাস তাঁর ছেলেকে ধর্ম, সত্য এবং ব্রহ্মজীবনের নানান উপদেশ দেবার পরে বলছেন -- বাছা! তপস্বীদের তপোবনে যে ছেলের জন্ম হল এবং তপস্বীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে - থাকতে তপস্যার মধ্যেই যার মৃত্যু হল, তার ধর্মবোধ কতটা পকিপক্ক হল, তা বলা খুব মুশকিল। কেননা কামনা - বাসনার ভোগ - উপভোগ যে কেমন জিনিস সে তো তা টেরই পেল না, সেখানে ধর্ম ব্যাপারটাই বোধ হয়, লঘু হয়ে গেল --- 'তেষাম্ অল্পতরো ধর্মঃ কামভোগান্ অজানতাম্'। আমি বরঞ্চ বলি -- যে কামনার ভোগ কাকে বলে সেটা জেনে তবে ভোগটা ত্যাগ করে এবং তপস্যা করে -- তাকে আমি অনেক বড় বলে মানি।

ব্যাস গম্ভীর হয়ে কথা বলছেন বলেই সে - কথা আমার মতো লোকের নষ্ট কথা নয়। মহাভারতের কথা বলে আমি যে বোঝাতে চাই, সেটা হল -- জীবনের সমস্ত কৌতূহল - বিবর্জিত টিন - বদ্ধ ভদ্র হওয়াটা যত কঠিন, ভদ্রজনের পক্ষে নষ্ট হওয়াটা কিন্তু তার চেয়ে অনেক কঠিন। কেননা সমাজ, তিনি ভুবনের সমস্ত শাসন, ঐতিহ্য এবং পরম্পরার মধ্যে ভদ্র সভ্য হওয়ার যে চরম হাতছানি থাকে, আমাকে সবাই ভাল বলবে -- এই শুভৈষণার মধ্যে যত গৌবর থাকে -- সেই মর্যাদা -

গৌরবকে অতিক্রম করে শৈশবে গুলি খেলে পড়াশুনোয় ভালো না হওয়াটার যেমন কঠিন তেমনই কঠিন ঝগড়া - মারামারির জায়গায় দাঁড়িয়ে সর্বান্তঃকরণে সে - সব কথা শোনার, এমনকি হঠাৎ মার খেয়ে যাবার চমৎকারটুকু গ্রহণ করার। প্রতিবেশীর দাম্পত্য - কলহ শুনতে আমার তো দাণ লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, যারা এই সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবীর সমস্ত প্রকার - বিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখল নিজেদের, তাঁরা বঞ্চিত রইলেন সার্বিকভা৪বে জীবনকে পাওয়ার আনন্দ থেকে। এই বিকার যাঁদের নেই তাঁরাই দেড় ঘন্টা / দু - ঘন্টা ধরে রাস্তায় নুইয়ে - পড়া মানুষের শান্ত মৃত্যু দেখতে পারেন। এই বিকার যাঁদের নেই তাঁরা পৌষেয়তার শিকার হতে দেখেও সেই বিপর্যস্তা রমণীর পূর্বচরিত্রদোষ খুঁজে বারকরেন। বস্তুত এরা কোনদিন নীতিভ্রষ্ট হয়ে প্রেমও করতে পারবেন না। আমাদের নীতিশাস্ত্র বলে -- আত্মীয়জন, জ্ঞাতি, শরিকরা যদি বেঁচে থাকে, তবে আগুন জিনিসটার আর প্রয়োজনই নেই ---- 'জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিম্' -- ভিতরে যদি অনন্ত ক্ষমা থাকে, তবে আর কথাবার্তা বলে কিছু লাভ নেই, আর যদি তোমার ভিতরে অনন্ত ক্রোধ থাকে, তাহলে তোমার কোনো শত্রুই থাকতে পারে না, যদি দেশে সাপথাকে অনেক তাহলে দুর্জন - খালের কোনো প্রয়োজনই থাকেনা, সাপেই চলে যাবে। আমি বলি কি -- এইভাবে যে একটু ভাবতে পারে, সেই কিন্তু পৃথিবীর বিকার বৈচিত্র্যটুকু জানে। নইলে জীবনের সকালবেলা থেকে পড়াশুনো আরম্ভ করলাম, খেলাম, মলত্যাগ করলাম, ভাল ছেলে হলাম, বড় চাকরি করলাম, অসম্ভব সুন্দরী স্ত্রীকে সারা জীবন বৈবাহিক ধর্ষণ করলাম, তারপর একটা 'ডিসেন্ট ত্রিমেশন' -- কী অপূর্ব শান্ত বীজন জীবন! এরা একবারও খেয়াল করে দেখল না যে, বিধাতার মতো রসিক পুষ আর হয় না। সংস্কৃত পুরাণ বলে --- তিনি যখন সৃষ্টির তপস্যায় বসে ছিলেন, তখন প্রথমে তিনি জরা - দুঃখ - মরণহীন কতগুলি প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টিকরার পর তিনি দেখলেন --- তাঁদের কোনো বিকার নেই। বিধাতা বড় দুঃখিত হয়ে ভাবলেন -- এ আমি কী সৃষ্টি করলাম। বিধাতা আবারও বসলেন সৃষ্টির তপস্যায় --- তিনি দেবতা সৃষ্টি করলেন, দৈত্য - দানব সৃষ্টি করলেন, মানব সৃষ্টি করলেন, বানালেন পশু - পাখি- সাপ --- সবকিছুই। বৈচিত্র্যে পৃথিবী ভরে গেল।

আমি বলি --- সৃষ্টি যিনি করেন, তিনি কখনোই এমন নিরেট বিদ্যাবান পুষ হন না, তাঁর মধ্যে ও কিছু দুষ্টামি - নষ্টামি আছে, যে কারণে দেবতার সঙ্গে তাঁকে দৈত্য - দানবও তৈরী করতে হয়। এক মহাকবি বিধাতার এই সৃষ্টিরঙ্গের কথা বলতে গিয়ে অদ্ভুত সুন্দর করে বলেছেন --- কী আর করা যাবে! আসলে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা সৃষ্টিকার্যে বসার সময় বুদ্ধিদাতা কোনো সহায় পাননি বলে -- সোনার অলংকারের মধ্যে তিনি কোনো গন্ধ দেননি, এমন যে শক্তপোক্ত বাঁশের মতো ইক্ষুদন্ড, তাতে কোনো ফল দিলেন না বিধাতা, চন্দন গাছে দিলেন না চন্দনগন্ধী ফুল; আরো আশর্চ্য, বটগাছের মতো এক বড় ঝাঁকড়া একটা গাছ কতটুকু - টুকু ফল দিয়েছে বিধাতা, আর নরম - সরম লতা - গাছে এত - বড়ো - বড়ো লাউ - কুমড়ো। আমার ধারণা -- এই দুষ্টুমিটুকু না থাকলে কোনো জিনিস মানায় না, জীবনটাই হয়ে যায় কৌতূহলহীন ভাল ছেলের মতো। বাচ্চা ছেলে লোভে, কামনায় মিথ্যা কথা বলে না, দেশের মন্ত্রী এতটুকুও টাকা আত্মসাৎ বা পার্টিসাৎ না করে শুধুই দেশের উন্নতি করেন, বিদ্বান ব্যক্তি সুচতুর রসিক না হয়ে শুধুই পরীক্ষার নোট তৈরি করেন, আর সুন্দরী যুবতী এতটুকুও প্রদর্শনী - দুষ্টতায় মন না দিয়ে শুধুই স্বামী - সেবা করেন --- এমন একটা জরা - মরণহীন রাজ্যে কোন মহাভারত লিখবেন দ্বৈপায়ন ব্যাস!

হয়তো বা এর জীবনের প্রাপ্য বিষয়ে কিছু মন্থরতা প্রয়োজন, প্রয়োজন কিছু শিথিলতা যা মানুষকে ভিন্নতর এক প্রবল চঞ্চল গতি দেয়। এ এক এমন পাগল কৌতূহল যাতে কেঁদুলির কুয়াশায় বসে খ্যাপা বাউলের গান শোনা যায় ---'ওরে মেয়ে যদি চিনবি তবে সাধন - ভজন কর'। এ এক এমন কৌতূহল, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রতন ব্রহ্মচারী সারা দিনমান ল্যাবরেটারিতে বসে সুন্দরবনী বাঘের গায়ের গন্ধের সঙ্গে বাসমতী চালের গন্ধমিল খুঁজে বেড়ান। এ এক এমন কৌতূহল, যাতে আলেকজাণ্ডার নেমে আসেন রাজপথবাসী দার্শনিকের কাছে। সে দার্শনিক রাস্তাতেই দিন কাটান। চিরন্তন জ্ঞান -- কৌতূহলী, অ্যারিস্টটলের শিষ্য আকেলকজাণ্ডার খবর পেলেন--- দার্শনিক ডায়োজিনিস রাস্তাতেই থাকেন। তিনি টাকা - পয়সার থলি নিয়ে শুধু তাঁর কথা শোনবার জন্য নেমে এলেন রাস্তায়। তখন শীতকাল চলছে, প্রবল শীত। দার্শনিক ডায়োজিনিস বসে - বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। আলেকজান্ডার বিনতি করে শিথিল - নিষন্ন দার্শনিকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন -- মহাশয়! আপনি এইভাবে এখানে বসে আছে, বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি। ডায়োজিনিস উত্তর বলেছিলেন -- বাস্টার্ড! তুমি আপাতত আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে এই রোদ্দুরটা ছেড়ে দিতে পারো। আমার শীত করছে।

এই চমকে, এই চমৎকারে যে কথা বলে, তাঁর সঙ্গে আলেকডান্ডারের মতো কৌতূহলী মানুষই বসতে পারেন দার্শনিক তত্ত্ব শোনবার জন্য। অথবা সাত দিন পর মৃত্যু হবে জেনেও পরীক্ষিৎ মহারাজ ক্ষুধা - তৃষ্ণা বাদ দিয়ে প্রায় ন্যাংটো শুকদেবের কাছে শুনতে পান ভাগবত পুরাণ, কৃষ্ণের লীলা - গুণ - গান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com